পঞ্চম অধ্যায়

অসীম শূন্য

শূন্য এবং বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

গণিত সাধারণত নীতিতে অনড় থাকে। কিন্তু অসীম পরিমাণ বড় অপ ছোট জিনিসের আগমন গণিতকে নীতিতে আপোষ করতে অভ্যস্ত করল। গাণিতক বিষয়সমূহের পরম ///বৈধতা/// ও অখণ্ডনীয় প্রমাণের আদিম অবস্থা চিরতরে বিদায় নিল।বিতর্কের যুগের উদ্বোধন হলো। আমরা সে বিন্দুতে পৌঁছে গেলাম, যেখানে মানুষ অন্তরীকরণ ও যোগজীকরণ করে বুঝে-শুনে নয়, বরং বিশ্বাসের জায়গা থেকে। কারণ, এখন পর্যন্ত এর ফলাফল সঠক এসেছে।

-- ফ্রিদরিখ এংগেলস।

শূন্য এবং অসীম এরিস্টটলীয় দর্শনকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। শূন্যতা ও অসীমতা বাদামের খোসার মহাবিশ্বকে ধারণা বাতিল করে দিয়েছিল। বাতিল করে চিয়েছিল প্রকৃতির শূন্যস্থানকে অপছন্দ করার ধারণা। প্রাচীন জ্ঞান হয়ে গেল মূল্যহীন। বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির ক্রিয়াকৌশল বিষয়ক সূত্র তৈরি করছিলেন। তবে এ বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মধ্যেও একটি অসুবিধা থেকে গেল: শূন্য। বিজ্ঞান জগতের তক্ষণ নতুন শক্তিশালী হাতিয়ার ক্যালকুলাস। কিন্তু এর গভীরে লুকিয়ে থাকল একটি প্যারাডক্স১। ক্যালকুলাসের উদ্ভাবক আইজ্যাক নিউটন ও গটফ্রিড উইলহেলম লিবনিজ///চেক বানান ও উচ্চারণ///। শূন্য দিয়ে ভাগ আর অসীমসংখ্য শূন্যকে যোগ করে তারা বানিয়ে ফেলেন গণিতের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। দুটো কাজই অবৈধ। এ যেন ১ + ১ = ৩ লেখা। মৌলিকভাবে ক্যালকুলাস গাণিতিক যুক্তি মেনে চলেনি। একে গ্রহণ করতে হলে নিতে হয় বিশ্বাসের আশ্রয়। বিজ্ঞানীরা তা করলেন। কারণ ক্যালকুলাস হলো প্রকৃতির ভাষা। এ ভাষাটা ভাল করে বুঝতে হলে অসীম শূন্যকে জয় করা চাই।

ইউরোপ ঘুমিয়ে কাঁটাল এক হাজার বছর। খৃষ্টীয় ফাদাররা দারুণ দক্ষতায় সে ঘুমের খাইয়ে দিয়েছিল। ইউরোপীয়রা সে ঘুম থেকে জেগে উঠল শূন্যকে সাথে নিয়ে।

-- টোবিয়াস ড্যান্টসিগ, নাম্বার: দ্য ল্যাংগুয়েজ অব সায়েন্স

শূন্যের অভিশাপ গণিতকে দুই হাজার বছর তাড়ীয়ে বেড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল অ্যাকিলিজকে আজীবন কচ্ছপের পেছনে ছুটতে হবে। ধরতে পারবে না কখনোই। জেনোর সরল ধাঁধাঁর মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসীম। অ্যাকিলিজের অসীম ধাপ গ্রিকদের হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। তারা অসীম পদক্ষেপকে যোগ করার কথা ভাবেনি কভুও। যদিও অ্যাকিলিজের পদক্ষেপ ক্রমেই ছোট হয়ে শূন্যের দিকে এগোচ্ছিল। শূন্যের ধারণা ছাড়া আসলে এ যোগ করার সাধ্য তাদের ছিল না। তবে পশ্চিম শূন্যকে গ্রহণ করে নিলে গণিতবিদরা অসীমকে করায়ত্ত্ব করলেন। শেষ হলো অ্যাকিলিজের রেস।

জেনোর ধারায় অসীম অংশ আছে, সত্য। তবুও আমরা সবগুলো পদক্ষেপ যোগ করতে পারি। এরপরেও পাব সসীম মান। ১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ... = ২। এ কৌশল প্রথম খাটান ব্রিটিশ যুক্তিবিদ রিচার্ড সুইসেথ। অসীম পদকে যোগ করে সসীম মান বের করেন তিনি। তিনি সংখ্যার একটি অসীম ধারা নেন। ১/২, ২/৪, ৩/৮, ৪/১৬, ..., n/2^n,…। এবার এদেরকে যোগ। পাওয়া যাচ্ছে দুই। দেখাই যাচ্ছে, ধারার সংখ্যাগুলো ক্রমেই শূন্যের কাছাকাছি হচ্ছে। কেউ হয়ত বলে ফলবেন, এ কারণই তো সসীম মান আসার জন্য যথেষ্ট। হায়! অসীম যদি এত সরল হত!

প্রায় একই সময়ের কথা। ফরাসি গণিতবিদ নিকোল ওরেম কাজ করছিলেন আরেকটি অসীম সংখ্যার ধারা নিয়ে। গালভরা নাম তরঙ্গ ধারা।

১/২ + ১/৩ + ১/৪ + ১/৫ + ১/৬ + ... জেনো এবং সুইসেথের ধারার মতোই পদগুলো শূন্যের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সুইসেথ এদেরকে যোগ করতে গিয়ে দেখেন, যোগফল ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে। প্রত্যেকটা পদ আলাদাভাবে শূন্যের দিকে গেলেও যোগফল যাচ্ছে অসীমের দিকে। পদগুলোকে গুচ্ছে গুচ্ছে রেখে ওরেম এটা দেখান। ১/২ + (১/৩ + ১/৪) + (১/৫ + ১/৬ + ১/৭ + ১/৮) + ...। প্রথম গুচ্ছের মান ১/২। পরের গুচ্ছ (১/৪ + ১/৪) বা ১/২-এর চেয়ে বড়। (কারণ তিন ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভায়ের চেয়ে বেশি) একইভাবে পরের গুচ্ছ (১/৮ + ১/৮ + ১/৮ + ১/৮) বা ১/২-এর চেয়ে বড়। এভাবেই চলছে। ক্রমেই ১/২ করে যোগ হচ্ছেই। যোগফলও বড় হচ্ছে। যাচ্ছে অসীমের দিকে। পদগুলো শূন্যের দিকে গেলেও তা যথেষ্ট দ্রুত হারে হচ্ছে না। তার মানে, সংখ্যারা নিজেরা শূন্যের দিকে গেলেও অসীম সংখ্যার যোগফল অসীম হতে পারে। তবুও অসীম যোগফলের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক কিন্তু এটা নয়। শূন্য নিজেও অসীমের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়।

এই ধারাটার কথা ভাবুন:

১ - ১ + ১ – ১ + ১ - ১ + ১ – ১ + ১ - ...

এর যোগফল শূন্য দেখানো কঠিন কিছু নয়। কত সহজ কাজ:

(১ – ১) + (১ – ১) + (১ – ১) + (১ – ১) + (১ – ১) + ... = ০ + ০ + ০ + ০ + ০ + ...

অতএব শূন্য। কিন্তু অন্যভাবে দেখুন।

১ + (-১ + ১) + (-১ + ১) + (-১ + ১) + (-১ + ১) + (-১ + ১) + …

একে লেখা যায়

১ + ০ + ০ + ০ + ০ + ০ + …

যার মান ১। শূন্যের অসীম যোগফল একইসাথে ০ ও ১ হতে পারে। ইতালীয় পুরোহিত গুইডো গ্রান্ডি তো এই ধারা দিয়ে প্রমাণ করেন ঈশ্বর শূন্য (০) থেকে মহাবিশ্ব (১) সৃষ্টি করতে পারেন। আসলে এই ধারাকে যেকোনো কিছুর সমান প্রমাণ করা যায়। তা করতে হলে ১ ও (-১) এর বদলে ৫ ও (-৫) দিয়ে শুরু করুন (অথবা মূল ধারা থেকেই ৫টি ১ বের করে নিয়ে বাকিদেরকে (১ - ১) + (১ – ১) + ... এভাবে লিখুন।

অসীমসংখ্যক জিনিসকে নিজেদের সাথে যোগ করলে অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ফলাফল পাওয়া যায়। কখনো সংখ্যারা শূন্যের দিকে যোগফল হয় নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা। ২ বা ৫৩-এর মতো নাদুসনুদুস কোনো সংখ্যা। কখনো আবার যোগফল ধেয়ে চলে অসীমের দিকে। শূন্যের অসীম যোগফল আবার যেকোনো কিছুর সমান হতে পারে। কী অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলছে! কেউ জানত না কীভাবে অসীমকে করায়ত্ত্ব করা যায়।

ভাগ্য ভাল যে গাণিতিক জগতের চেয়ে ভৌত জগতটাকে বেশি অর্থবহ লাগে। বাস্তব জগতে কাজ করলে আর অসীমসংখ্যক জিনিসকে যোগ করাটা কাজেও আসে। যেমন ধরুন পাত্রের আয়তন বের করতে গেলে কাজটা করা লাগতে পারে। ১৬১২ সাল ছিল এমন কাজের উপযুক্ত একটি সময়।

এখানেও নায়ক জোহানেস কেপলার। যিনি গ্রহদের উপবৃত্তাকার পথের প্রমাণ দিয়েছিলেন। ঐ বছরটিতে তিনি পাত্রের আয়তন নিয়ে মগ্ন থাকেন। তিনি খেয়াল করেছিলেন পাত্রের নির্মাতা ও ব্যবহারকারীরা কাজটা করে খুব কাঁচা হাতে। কেপলার তাদের সাহায্যে কাজে নেমে পড়লেন। মনে মনে তিনি পাত্রকে অসীমসংখ্যক অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করলেন। এরপর আবার তাদেরকে জোড়া দিয়ে পাত্রের আয়তন বের করলেন। পাত্রের পরিমাপের পেছনমুখী পদ্ধতি মনে হতে পারে একে। তবে ভাবনাটি ছিল চমৎকার।

সমস্যাটাকে সহজ করে বলা যাক। ত্রিমাত্রিক বস্তুর বদলে দুই মাত্রার একটি জিনিস কল্পনা করি। ধরুন একটি ত্রিভুজ। ২৩ নং চিত্রের ত্রিভজের উচ্চতা ও ভূমি ৮ একক করে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পেতে ভূমি ও উচ্চতা গুণ করে দুই দিয়ে ভাগ দিতে হয়। অতএব এ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৩২ একক।

এবার ধরুন অন্যভাবে আমরা ক্ষেত্রফল বের করব। ত্রিভুজের ভেতরে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র বানিয়ে সেগুলোর ক্ষেত্রফল যোগ করব। প্রথম চেষ্টায় আমরা পাচ্ছি ১৬ একক (৪×৪)। যা মূল ক্ষেত্রফল থেকে অনেক কম। পরেরবার আরেকটু ভাল ফল এসেছে। এবার নিয়েছি তিনটি আয়ত। এবার পেলাম ২×২ + ২×৪ + ২×৬ = ২৪ একক। আগের চেয়েও ভাল হলেও মূল মান থেকে বেশ দূরে এখনও। তৃতীয় চেষ্টায় পাই ২৮। বোঝাই যাচ্ছে, আয়তক্ষেত্রকে ক্রমশ ছোট করতে থাকলে এদের মোট ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের খুব কাছাকাছি হয়। অনেক ছোট আয়তদের Δx চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Δx ছোট হওয়া আমনে আসলে শূন্যের দিকে যাওয়া। (এ আয়তদের যোগফল হলো Σf(x), যেখানে গ্রিক বর্ণ Σ (সিগমা) হলো একটি উপযুক্ত পরিসরের যোগফল বা সমষ্টির প্রতীক। আর f(x) হলো আয়তক্ষেত্রগামী রেখার সমীকরণ। আধুনিক প্রতীকে Δx শূন্যের দিকে যেতে থাকলে Σ চিহ্নকে নতুন আরেকটি প্রতীক ∫ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর ∫ এর সাথে dx বসিয়ে সমীকরণকে ∫f(x)dx লেখা হয়। এর নাম ইন্টিগ্র্যাল বা যোগজ।

চিত্র ২৩: ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পরিমাপ

কেপলারের এ কাজটার কথা বেশি মানুষ জানে না। তবে এ কাজটিই তিনি করেছিলেন তিন মাত্রায়। ব্যারেলের আয়তন পরিমাপ করতে গিয়ে। এর জন্য তিনি ব্যারেলকে কেটে বিভিন্ন তল বানান। পরে এদের আয়তন যোগ করে পান পাত্রের আয়তন। শূন্য নিয়ে একটা সমস্যা ছিল। তবে কেপলার সে সমস্যার চোখ রাঙানি করে কাজ চালিয়ে যান। Δx এর মান শূন্যের দিকে যেতে থাকলে অসীমসংখ্যক শূন্যকে যোগ করতে হয়। যার কোনো অর্থই নেই। কেপলার এ সমস্যা উপেক্ষা করেন। যুক্তির বিচারে অসীমসংখ্যক শূন্যকে যোগ করা অর্থহীন কাজ হলে কাজটার ফলাফল পাওয়া গেল যথাযথ।

বস্তুকে অসীম পরিমাণ ছোট করার মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানী কেপলার একাই নন। অসীম ও অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র এসব খণ্ডের কথা নিয়ে ভেবেছিলেন গ্যালিলেওও। এই দুটি ধারণা আমাদের সসীম জ্ঞানের পরিধির বাইরে। তিনি লেখেন, “প্রথমটি আমরা বুঝতে পারি না এর বিশালতার কারণে, আর পরেরটি এর তুচ্ছতার জন্য।" তবে অসীম শূন্য রহস্যময় হলেও গ্যালিলেও এর শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন, "একবার ভাবুন দুটোকে একত্র করলে কী হতে পারে।" গ্যালিলেওর ছাত্র বোনাভেন্টুরা কাভালিয়েরি এর আংশিক উত্তর দিয়েছিলেন।

ব্যারেলের বদলে কাভালিয়েরি জ্যামিতিক বস্তু নিয়ে কাজ করেন। কাভালিয়েরির মতে ত্রিভুজের মতো সব ক্ষেত্রফলই অসীমসংখ্যক শূন্যদৈর্ঘ্যের রেখা দিয়ে গঠিত। আর আয়তন গঠিত অসীমসংখ্যক শূন্যউচ্চতার তল নিয়ে। এসব অবিভাজ্য রেখা ও তল ক্ষেত্রফল ও আয়তনের পরমাণুর মতো। এদেরকে আর ভাগ করা যাবে না। চিকন খণ্ড দিয়ে কেপলার ঠিক যেভাবে ব্যারেলের আয়তন মেপেছিলেন, কাভালিয়েরি সেভাবেই অসীমসংখ্যক অবিভাজ্য শূন্যকে যোগ করে জ্যামতিক বস্তুর ক্ষেত্রফল বা আয়তন বের করেন।

কাভালিয়েরির বক্তব্য জ্যামিতিকদের বিব্রত করে। শূন্য ক্ষেত্রফলের অসীমসংখ্যক রেখা যোগ করে দ্বিমাত্রিক ত্রিভুজ ছিলেন। একইভাবে অসীমসংখ্যক শূন আয়তনের তল যোগ করে ত্রিমাত্রিক কাঠামো পাওয়া যাবে না। সমস্যা আসলে একই জায়গায়: অসীম শূন্যের কোনো অর্থ নেই। তবে কাভালিয়েরির পদ্ধতি সবসময় সঠিক উত্তর দিচ্ছিল। অসীম শূন্যকে যোগ করার যুক্তিগত ও দার্শনিক সমস্যা গণিত্যবিদরা উপেক্ষা করেন। এর কারণও আছে। অসীম ক্ষুদ্র বা অবিভাজ্য ধারণার মাধ্যমে সমাধান মিলল দীর্ঘদিনের এক ধাঁধাঁর। এটা হলো স্পর্শকের সমস্যা। স্পর্শক হলো একটি রেখা, যা কোনো কার্ভকে শুধু স্পর্শ করে সোজা চলে যায়। মসৃণভাবে বেয়ে চলা একটি কার্ভের যেকোনো বিন্দুতেই এমন একটি রেখা থাকবে যা কার্ভকে আলতো করে স্পর্শ করে চলে যাবে। কার্ভকে স্পর্শ করবে একটিমাত্র বিন্দুতে। এটাই স্পর্শক। গণিতবিদরা দেখলেন, গতি নিয়ে কাজ করতে গেলে জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, সুতোয় একটি বল বেঁধে আপনার মাথার চারপাশে ঘোরাচ্ছেন। বল ঘুরবে বৃত্তাকার পথে। হথাৎ সুতো ছিঁড়ে গেলে বল এক দিকে উড়ে চলে যাবে। আর এ গমন পথ হবে স্পর্শক রেখা বরাবর।বল নিক্ষেপের সময় বেসবল খেলোয়াড়ের বাহু বৃত্তচাপের পথ বেয়ে ঘোরে। বল ছেড়ে দেওয়া মাত্রই সেটা চলে স্পর্শক বরাবর (চিত্র ২৪)। আবার ধরুন পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়া বল কোথায় এসে থামবে জানতে হলে বের করতে হবে কোথায় স্পর্শক অনুভূমিকের সমান্তরাল। স্পর্শক রেখা কম-বেশি খাড়া হতে পারে। এ পরিমাপের নাম ঢাল। পদার্থবিদ্যায় আছে যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ধরুন, একটি কার্ভ দিয়ে একটি বাইসাইকেলের অবস্থান প্রকাশ করা হলো। তাহলে স্পর্শক রেখার ঢাল বলে দেবে, কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করার সময় বাইসাইকেলের বেগ কত থাকবে।

চিত্র ২৪: স্পর্শক বরাবর গতি

এ কারণেই সতের শতকের বহু গণিতবিদ কোনো কার্ভের নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক রেখার পরিমাপের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এ তালিকায় ইভানজেলিস্টা টরিসেলি, রেনে ডেকার্ট, ফরাসি ভদ্রলোক পিয়ের ডে ফের্মা (তাঁর শেষ উপপাদ্যের জন্য বিখ্যাত) আর ইংরেজ ভদ্রলোক আইস্যাক ব্যারো। তবে কাভালিয়েরির মতোই সবগুলোতেই অসীম ক্ষুদ্রের সমস্যা পাওয়া গেল।

কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক আঁকতে হলে সবচেয়ে ভালো কাজ হলো অনুমান দিয়ে শুরু করা। এবার পাশেই আরেকটি বিন্দু নিয়ে দুটোকে যোগ করে দিন। যে রেখা পাওয়া যাবে সেটাই ঠিক স্পর্শক নয়। তবে কার্ভটা খুব বেশি উঁচি-নিচু না হলে রেখা দুটি খুব কাছাকাছি হবে (চিত্র ২৫)। বিন্দুগুলোর মধ্যে দূরত্ব কমাতে থাকলে অনুমান স্পর্শক রেখার খুব কাছাকাছি হতে থাকবে (চিত্র ২৫)। বিন্দুগুলো একে অপর থেকে শূন্য দূরত্বে থাকলে অনুমান হবে নিখুঁত। পাওয়া গেছে স্পর্শক। তবে ঝামেলা একটা আছে।

চিত্র ২৫: স্পর্শক রেখার অনুমান

একটি রেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এর ঢাল। ঢাল মাপার জন্য গণিতবিদরা দেখেন একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি রেখা কত উঁচুতে উঠল। যেমন ধরুন, একটি পাহাড়ে আপনি পূর্ব দিকে গাড়ি চালাচ্ছেন। প্রতি মাইল পূর্বে যেতে যেতে আপনি অর্ধমাইল মাইল উপরে উঠছেন। এমন পাহাড়ের ঢাল মাপা খুব সহজ। আপনি ভূমির সমান্তরালে যেতে এক মাইল গিয়ে উপরে উঠেছেন অর্ধেক মাইল। এই অর্ধেক মাইলই এই পাহাড়ের ঢাল। গণিতের ভাষায় ঢালের মান ১/২। একই কথা খাটে রেখার জন্যও। রেখার ঢাল মাপার জন্য দেখতে হবে নির্দিষ্ট অনুভূমিক দূরত্ব (Δx) পার হতে হতে কতটুকু ওপরে ওঠে (Δy)। রেখার ঢাল তাই হবে Δy/Δx।

স্পর্শক রেখার ঢাল হিসাব করতে গেলে কাছাকাছি মান বের করার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে দেয় শূন্য। স্পর্শক রেখার আসন্ন মান যত ভাল হতে থাকে, আসন্ন মান পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা বিন্দুগুলো তত কাছাকাছি হতে থাকে। তার মানে, বিন্দুগুলোর অনুভূমিক দূরত্বের পার্থক্যের (Δx) সাথে সাথে উচ্চতার পার্থক্যও (Δy) শূন্যের দিকে যেতে থাকে। স্পর্শকের আসন্ন মান নিখুঁত হতে থাকলে Δy/Δx এর মান ০/০-এর দিকে যেতে থাকে। শূন্য শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে মহাবিশ্বের যেকোনো সংখ্যা পাওয়া সম্ভব। স্পর্শক রেখার ঢালের কি কোনো অর্থ আছে?

অসীম বা শূন্য নিয়ে কাজ করতে গেলেই গণিতবিদরা যুক্তির গোলকধাঁধায় পড়ে যান। ব্যারেলের আয়তন বা পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করতে তারা অসীম শূন্যকে যোগ করেছেন। কার্ভের স্পর্শক বের করতে তারা শূন্যকে ভাগ দিয়েছেন শূন্য দিয়েই। স্পর্শক ও ক্ষেত্রফল বের করার মতো সরল কাজকে শূন্য ও অসীম স্ববিরোধী কাজের মতো করে ছাড়ল। ছোট সমস্যা মনে করে এদের কথা হয়তো সবাই ভুলেই যেত। কিন্ত মহাবিশ্বকে বুঝতে হলে যে অসীম ও শূন্যই মূল ভূমিকা পালন করে।

শূন্য ও মরমি ক্যালকুলাস

*পর্দা উঠিয়ে ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখব শূন্যতা, অন্ধকার ও বিভ্রান্তি। ভুল না হয়ে থাকলে আমি বরং বলব পুরোপুরি অসম্ভব ও অসঙ্গতি। এরা না সসীম রাশি, আর না অসীম পরিমাণ ছোট, আর না শূন্যের সমান ছোট। আমরা কি এদেরকে মৃত রাশির ভূত বলতে পারি?*

-- বিশপ বার্কলি, দ্য অ্যানালিস্ট

স্পর্শক ও ক্ষেত্রফলের দুই সমস্যাই অসীম ও শূন্যের সাথে টক্কর লাগায়। এতে অবাক হওয়ার কিছুও নেই। দুই সমস্যা আসলে একই। দুটোই ক্যালকুলাসের জিনিস। ক্যালকুলাসের মতো এত শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। এই যেমন টেলিস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা আগে অদেখা চাঁদ ও তারার জগত দেখতে সক্ষম হন। কিন্তু ক্যালকুলাসের কাজটা অন্য মাত্রার। এর মাধ্যমে মহাজাগতিক বস্তুর গতি নির্ণায়ক সূত্রগুলোকে প্রকাশ করা গেল। যে সূত্রই শেষ পর্যন্ত বলে দেয়, চাঁদ ও তারা তৈরি হয়েছিল কীভাবে। ক্যালকুলাস হয়ে গেল প্রকৃতিরই ভাষা। কিন্তু এরই পড়তে পরতে আবার মিশে আছে অসীম ও শূন্য। যা নতুন এই হাতিয়ারের জন্য হুমকিস্বরূপ।

ক্যালকুলাসের প্রথম উদ্ভাবক জন্মের পর প্রথম নিঃশ্বাসের আগেই অল্পের জন্য মারা যাচ্ছিলেন। ১৬৪২ সালের বড়দিনের দিন স্বাভাবিক সময়ের আগেই জন্ম হয়। ছোট্ট এক শরীর মুচড়ে পৃথিবীর আলো দেখেন আইজ্যাক নিউটন। আকারে এত ছোট ছিলেন যে এক লিটারের একটি মগেই তার জায়গা হয়ে যেত। বাবা ছিলেন কৃষক। মারা যান নিউটনের জন্মের দুই মাস আগেই।

ছেলেবেলাটা কাটিয়েছেন অস্থিরতার২ মধ্য দিয়ে। মা চেয়েছিলেন নিউটনও কৃষক হোক। ১৬৬০-এর দশকে ক্যামব্রিজে ভর্তি হন। ভাল করেন পড়াশোনায়। কয়েক বছরের মধ্যেই স্পর্শক সমস্যা সমাধানের একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বের করেন। যেকোনো মসৃণ কার্ভের যেকোনো বিন্দুর স্পর্শক বের করতে পারতেন তিনি। এ কাজটা ক্যালকুলাসের অর্ধেক। নাম অন্তরীকরণ বা ব্যবকলন (differentiation)। তবে আমরা আজ ব্যাবকলন যেভাবে লিখি, নিউটনের পদ্ধতি তা থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল।

নিউটন ব্যাবকলন লিখতেন ফ্লুক্সোন বা গাণিতিক রাশিমালার প্রবাহ দিয়ে। তিনি অবশ্য এদের বলতেন ফ্লুয়েন্ট। নিউটনের ফ্লুক্সোনের একটি উদাহরণ এমন:

y=x2+x+1

এ সমীকরণে ফ্লুয়েন্ট হলো y ও x। নিউটন ধরে নেন, সময়ের সাথে y ও x এর মধ্যে পরিবর্তন বা প্রবাহ ঘটছে। এদের পরিবর্তনের হার বা ফ্লুক্সোনকে যথাক্রমে ẏ ও ẋ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ব্যাবকলন করতে নিউটন প্রতীক নিয়ে একটুখানি চাতুরী করেছেন। তিনি ফ্লুক্সোনদের পরিবর্তিত হতে দিয়েছেন। তবে সেটা অসীম ক্ষুদ্র হারে। তার মানে তিনি আসলে এদেরকে পরিবর্তন ঘটানোর বা প্রবাহিত হওয়ার জন্য কোনো সময়ই দেননি। নিউটনের প্রতীকে মুহূর্তের মধ্যে y হয়ে যাবে (y+Oẏ), যেভাবে x হয়ে যাবে (x+Oẋ)। (O অক্ষর দিয়ে প্রবাহিত সময়ের পরিমাণ বোঝানো হয়েছে। এটা বরাবর না হলেও প্রায় শূন্য। আমরা পরে আরও দেখব।) সমীকরণ তাহলে হয় এমন:

y+Oẏ = (x+Oẋ)2  + (x+Oẋ) + 1

(x+Oẋ)2 কে ভেঙে পাই:

y+Oẏ = x2+2x(Oẋ) + (Oẋ)2 + (x+Oẋ) + 1

পদগুলোকে সাজিয়ে পাই

y+Oẏ = (x2 + 2x +1) + 2x(Oẋ) + 1(Oẋ) + (Oẋ)2

এখন y = (x2 + 2x +1) হওয়ায় সমীকরণের উভয় পাশ থেকে এটাকে বাদ দেওয়া যায়। বাকি থাকে

Oẏ = 2x(Oẋ) + 1(Oẋ) + (Oẋ)2

আর এরপরেই আসে সেই বিশ্রী কৌশলটা। নিউটন বললেন Oẋ অনেক ছোট। (Oẋ)2 সে তুলনায় আরও অনেক অনেক ছোট। এটি রাশিমালা থেকে উধাও হয়ে যাবে। মূলত এটা শূন্য এবং উপেক্ষণীয়। তাহলে থাকে:

Oẏ = 2x(Oẋ) + 1(Oẋ)

তার মানে Oẏ/Oẋ = 2x +1, যা কার্ভটির যেকোনো বিন্দুতে স্পর্শক রেখার ঢাল (চিত্র ২৬)। অসীম ক্ষুদ্র সময়কাল O সমীকরণ থেকে ঝরে যায়। Oẏ/Oẋ হয়ে যায় ẏ/ẋ। O নিয়ে আর ভাবারই দরকার নেই।

এ কৌশলে মেলে সঠিক উত্তর। কিন্তু রাশি উধাও করে দেওয়ার ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর। নিউটনের কথা অনুসারে (Oẋ)2, (Oẋ)3, Oẋ এর উচ্চঘাতগুলো শূন্য হলে Oẋ নিজেও শূন্য হবে৩। অন্যদিকে, Oẋ শূন্য হলে শেষের দিকে আমরা যে Oẋ দিয়ে ভাগ দিয়েছি সেটা আসলে শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়ার নামান্তর। একই কথা খাতে একদম শেষ ধাপের ক্ষেত্রে। এখানেও Oẏ/Oẋ ভগাংশের হর ও লব থেকে O-কে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা শূন্য দিয়ে ভাগ দিয়েছি। শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়া গাণিতিক যুক্তিতে নিষিদ্ধ কাজ।

চিত্র ২৬: y=x2+x+1 পরাবৃত্তের কোনো বিন্দুতে ঢাল বের করতে হলে 2x +1 ব্যবহার করতে হবে।

নিউটনের ফ্লুক্সোন পদ্ধতি ছিল খুবই সন্দেহজনক। এটা করতে গিয়ে করা হয়েছে একটি অবৈধ গাণিতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এর ছিল বিশাল এক সুবিধা। এ পদ্ধতি বাস্তবে কার্যকর। ফ্লুক্সোন পদ্ধতি সমাধান করেছে স্পর্শকের সমস্যা। সমাধান করেছে ক্ষেত্রফলের সমস্যাও। কোনো কার্ভ বা রেখা দ্বারা আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে করতে হবে ব্যাবকলনের বিপরীত কাজ। যাকে আমরা বলি যোগজীকরণ। y=x2+x+1 কে ব্যাবকলন করলে স্পর্শকের ঢাল 2x +1 পাওয়া যায়। তেমনি 2x +1 কে যোগজীকরণ করলে কার্ভ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র পাওয়া যায়। এ সূত্র হলো y=x2+x+1। দুটি সীমা x = a এবং x = b এর মধ্যে কার্ভটির ক্ষেত্রফল হবে (b2 + b +1) – (a2 + a+1) (চিত্র ২৭)। (সঠিক করে বললে সূত্রটা আসলে y = x2 + x + c), যেখানে c একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক। ব্যাবকলনের মাধ্যমে তথ্য হারিয়ে যায়। আর তাই যোগজীকরণ একদম নিখুঁত ফল দিতে পারে না। তা পেতে হলে দুটি সীমার (a, b) মান দিয়ে দিতে হবে।)

ক্যালকুলাস হলো দুটি উপকরণের সমাবেশ। যোগজীকরণ ও অন্তরীকরণ। হ্যাঁ, শূন্য ও অসীম নিয়ে খেলতে গিয়ে নিউটন গণিতের কিছু নিয়ম ভেঙেছেন। কিন্তু ক্যালকুলাস ছিল মারাত্মক শক্তিশালী। কোনো গণিতবিদ একে উপেক্ষা করতে পারলেন না।

প্রকৃতি কথা বলে সমীকরণ দিয়ে। অদ্ভুত এক কাকতালীয় ব্যাপার। গণিতের নিয়ম তৈরি হয়েছিল ভেড়া গুনতে আর জমির পরিমাপ করতে গিয়ে। আবার এই নিয়মগুলো দিয়েই চলে মহাবিশ্বের কাজ। প্রাকৃতিক সূত্রের প্রকাশ পায় গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে। আর সমীকরণ এক অর্থে একটি যন্ত্র। যাতে একটি সংখ্যা দিলে আরেকটি সংখ্যা পাওয়া যাবে। প্রাচীনকালেও মানুষ সমীকরণের কিছু নিয়ম জানত। যেমন লিভার বা চাপযন্ত্রের সূত্র। তবে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূচনা হলে একের পর সূত্রের আবির্ভাব হতে থাকল। কেপলারের তৃতীয় সূত্রের কথাই ধরুন। এ থেকে জানা যায়, গ্রহরা কক্ষপথে পুরো ঘুরে আসতে কত সময় লাগবে। এ সময়টা হলো r3/t2 = k, যেখানে t হলো সময়, দূরত্ব r এবং k একটি ধ্রুবক। ১৬৬২ সালে রবার্ট বয়েল দেখান, আবদ্ধ পাত্রের গ্যাসে বাইরে থেকে চাপ দিলে ভেতরে চাপ বাড়বে। মজার ব্যাপার হলো চাপ p ও আয়তন v-এর গুণফল সবসময় ধ্রুব থাকে। pv = k যেখানে k ধ্রুবক। ১৬৭৬ সাল। রবার্ট হুক দেখেন স্প্রিংয়ের বল f পাওয়া যায় ঋণাত্মক ধ্রুবক (-k) কে দূরত্ব x দিয়ে গুণ করে। মানে f = -kx, যেখানে x হলো স্প্রিংকে টেনে যতটা বড় করা হলো। প্রথমদিকের এই সমীকরণ-সূত্রগুলো সরল সম্পর্ক খুব দারুণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছিল। কিন্তু সমীকরণের আছে সীমাবদ্ধতা। এদের অপরিবর্তনীয়তাই এদের সার্বজনীন সূত্র হওয়ার পথে বাধা।

চিত্র ২৭: 2x+1 রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মান পেতে x2 + x + 1 ব্যবহার করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে স্কুলে পড়া একটা বিখ্যাত সমীকরণ দেখা যাক। এটা থেকে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট বেগ v নিয়ে চললে t সময় পরে কত দূর (x) পৌঁছতে পারবেন। সে দূরত্বটা হলো x = vt। প্রতি ঘণ্টায় অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময় দিয়ে গুণ করলেই পাওয়া যাবে দূরত্ব। এক শহর থেকে আরেক শহরে নির্দিষ্ট বেগে যেতে কত সময় লাগবে তা বের করতে এ সমীকরণ দারুণ কার্যকর। যেমন ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে চললে ৬০ মাইল যেতে সময় লাগবে ৩০ মিনিট। কিন্তু বাস্তবে কয়টা জিনিস নির্দিষ্ট বেগে চলে? উপর থেকে একটি বল এর বেগ ক্রমেই বাড়বে। এক্ষেত্রে x = vt সূত্র একদম ভুল। (স্থিরাবস্থা থেকে) পতিত বলের ক্ষেত্রে সূত্র হবে x = gt2/2, যেখানে g হলো মহাকর্ষীয় ত্বরণ। বার বলের ওপর ক্রমেই বেশি বল (এবং সে কারণে ত্বরণ, মানে বেগের বৃদ্ধি) প্রয়োগ করলে x হবে t3/3 এর মতো কিছু। বেগকে সময় দিয়ে গুণ করে দূরত্ব পাওয়া সার্বজনীন কোনো সূত্র নয়। সকল ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা চলে না।

নিউটন ক্যালকুলাস দিয়ে এ সূত্রগুলোকে জোড়া দিয়ে এক গুচ্ছ সূত্র বানালেন, যেগুলো সকল অবস্থায় ও ক্ষেত্রে কাজ করে। এই প্রথমা বিজ্ঞান সাক্ষাৎ পেল সার্বজনীন সূত্রের। যে সূত্র ছোট ছোট আংশিক সূত্রগুলোর পেছনে থেকে কলকাঠি নাড়ায়। শূন্য ও অসীমের কারণে গণিতবিদরা জানতেন, ক্যালকুলাসের গভীরে লুকিয়ে আছে ত্রুটি। তবুও তাঁরা সহজেই নতুন এই হাতিয়ার লুফে নিলেন। সত্য কথা হলো, প্রকৃতি সাধারণ সমীকরণের ভাষায় নয়, কথা বলে অন্তরকীয় সমীকরণের ভাষায়। আর অন্তরকীয় সমীকরণ উপস্থাপন ও সমাধানের হাতিয়ারই হলো ক্যালকুলাস।

অন্তরকীয় সমীকরণ আমাদের চেনাজানা আর দশটা সমীকরণের মতো নয়। সাধারণ সমীকরণ হলো যন্ত্রের মতো। এতে একটি সংখ্যা দিলে ফিরিয়ে দেয় আরেকটি সংখ্যা। অন্তরকীয় সমীকরণও যন্ত্রের মতোই। তবে এক্ষেত্রে যন্ত্রের মধ্যে দেওয়া হয় সংখ্যার বদলে সমীকরণ। আর যন্ত্র ফিরিয়ে দেয় আরেকটি সমীকরণ। সমস্যার অবস্থার বিবরণ দেওয়া সমীকরণ দিলে (যেমন বল ধ্রুব বেগে চলছে কিনা বা বলের ওপর কোনো ফোর্স বা বল প্রযুক্ত হলো কিনা) পাওয়া যাবে কাঙ্ক্ষিত উত্তরের সমীকরণ (বল সরলরেখা বা পরাবৃত্ত পথে চলছে)। একটিমাত্র অন্তরকীয় সমীকরণ অগণিতসংখ্যক সমীকরণ-সূত্র নিয়ন্ত্রণ করে। আবার অন্য সমীকরণ-সূত্রের মতো এরা কখনও সত্য আবার কখনও মিথ্যা নয়। এরা সর্বদাই সত্য। সার্বজনীন সূত্র। এ যেন প্রকৃতির কলকব্জা পর্যবেক্ষণ।

নিউটনের ফ্লুক্সোন পদ্ধতির ক্যালকুলাস কাজটা করল অবস্থান, বেগ ও ত্বরণের মতো জিনিসগুলোকে জোড়া দিয়ে। তিনি অবস্থানকে x চলক দিয়ে প্রকাশ করেই তিনি বুঝলেন বেগ আসলে ফ্লুক্সোন ছাড়া কিছুই নয়। এই ফ্লুক্সোনকেই আধুনিক গণিতে x এর ডেরিভেটিভ বা অন্তরক (ẋ) বলে। আর ত্বরণ (ẍ) বেগের (ẋ) অন্তরক ছাড়া আর কিছুই নয়। অবস্থান থেকে বেগ ও সেখান থেকে ত্বরণে যাওয়া আর আবার উল্টো দিকে ফিরে আসার জন্য অন্তরীকরণ (ডট বাড়ানো) ও যোগজীকরণ (ডট কমানো) করে যেতে হবে। এই চিহ্ন দিয়েই নিউটন একটিমাত্র সরল অন্তরকীয় সমীকরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সব বস্তুর গতি প্রকাশ করে ফেলেন। সমীকরণটা হলো F = mẍ, যেখানে F হলো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল আর m সে বস্তুর ভর। (অবশ্য এটা সে অর্থে সার্বজনীন কোনো সূত্র নয়। বস্তুর ভর ধ্রুব থাকলেই কেবল এটা সত্য। নিউটনের সূত্র আরও সাধারণ সংস্করণ হলো F = ṗ, যেখানে p হলো বস্তুর ভরবেগ (momentum) পরে আইনস্টাইন নিউটনের সূত্রে আরও পরিমার্জন করেন।) আপনার কাছে কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলের সমীকরণ থাকলে অন্তরকীয় সমীকরণ বলবে সে বস্তুটা ঠিক কীভাবে চলাচল করবে। যেমন মুক্তভাবে পড়ন্ত বল পরাবৃত্ত পথে চলবে। আবার ঘর্ষণহীন স্প্রিং এদিক-ওদিক দোল খাবে চিরকাল। আর ঘর্ষণ থাকলে স্প্রিং ধীরে ধীরে স্থির হয়ে যাবে (চিত্র ২৮)। এ ফলাফলগুলোকে আলাদা আলাদা মনে হলেও এরা একই অন্তরকীয় সমীকরণ মেনে কাজ করে।

আবার একইভাবে বস্তুটা কীভাবে চলছে তা জানলেই অন্তরকীয় সমীকরণ আপনাকে বলে দেবে কী ধরনের বল তাতে প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুটা বল হোক আর গ্রহ হোক তাতে কোনো তফাৎ নেই। (নিউটনের সাফল্য ছিল মহাকর্ষ বলের সমীকরণ দিয়ে গ্রহদের কক্ষদের আকৃতি বের করা। মানুষ ধারণা করেছিল এই বল 1/r2 এর সমানুপাতিক হবে। পরে দেখা গেল, নিউটনের সমীকরণ থেকে উপবৃত্ত বেরিয়ে আসছে। এতে মানুষ নিউটনকে সঠিক বলে মেনে নিল।) ক্যালকুলাসের এত ক্ষমতা প্রদর্শনের পরেও মূল সমস্যা থেকেই গেল। নিউটনের কাজের ভিত্তিটা ছিল খুব নড়বড়ে। শূন্য দিয়ে ভাগ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজেরও একই সমস্যা ছিল।

চিত্র ২৮: একই অন্তরকীয় সমীকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন গতি

১৬৭৩ সাল। এক বিখ্যাত জার্মান আইনজীবী ও দার্শনিক লন্ডন সফরে যান। তাঁর নাম গটফ্রিড উইলহেল্ম লাইবনিৎস (লিবনিজ হিসেবে পরিচিত)। তিনি এবং নিউটন বিজ্ঞান জগতকে দুই পক্ষে বিভক্ত করে ফেলেন। তবে দুজনের কেউই ক্যালকুলাসের শূন্যের সমস্যা সমাধান করতে পারেননি।

লন্ডন ভ্রমণের সময় তেত্রিশ বছর বয়সী লিবনিজ নিউটনের অপ্রকাশিত কাজ দেখেছিলেন কি না তা কেউ জানে না। ১৬৭৩ থেকে ১৬৭৬ সালের মধ্যে লিবনিজ আবারও লন্ডন যান। এসময় তিনিও ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন। তবে সেটার চেহারা-সুরত খানিক আলাদা।

পেছনে তাকালে মনে হয়, লিবনিজ স্বতন্ত্রভাবেই ক্যালকুলাসের নিজস্ব সংস্করণ বানিয়েছিলেন। যদিও ব্যাপারটা এখনও বিতর্কিত। ১৬৭০-এর দশকে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। ফলে কে কাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছেন তো বোঝা মুশকিল। দুই তত্ত্বেরই ফলাফল একই। তবে চিহ্ন ও দর্শন পুরোপুরি আলাদা।

নিউটন অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র রাশিকে অপছন্দই করতেন। ক্ষুদ্র যে o গুলো ছিল তাঁর ফ্লুক্সোন সমীকরণে। যারা কখনও শূন্য আবার কখনও অশূন্যের মতো আচরণ করত। এক অর্থে এ অতিশয় ক্ষুদ্র রাশিরা ছিল অসীম পরিমাণ ক্ষুদ্র। চিন্তনীয় যেকোনো ধনাত্মক সংখ্যার চেয়ে ছোট। তবুও কোনোভাবে শূন্যের চেয়ে বড়। সে সময়ের গণিতবিদদের কাছে এ এক অদ্ভুত ধারণা। নিউটন নিজেও তাঁর সমীকরণের এ অতিশয় ক্ষুদ্র রাশি নিয়ে বিব্রত। তিনি এ সমস্যাকে লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। তাঁর হিসাবের মাঝখানেই শুধু এ ০ গুলো আসত। হিসাবের শেষ দিকে উধাও হয়ে যেতে অলৌকিকভাবে। ওদিকে লিবনিজ যেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের মধ্যেই আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছেন। নিউটন যেখানে লিখেছেন Oẋ, লিবনিজ সেখানে লিখেছেন dx, আর অর্থ x এর অতিশয় ক্ষুদ্র একটি অংশ। লিবনিজের হিসাব-নিকাশের পুরো অংশেই এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ররা অপরিবর্তিতভাবে টিকে আছে। এবং x-এর সাপেক্ষে y-এর অন্তরক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশি থেকে মুক্ত অনুপাত ফ্লুক্সোন ẏ/ẋ নয়। এটা বরং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুপাত dy/dx।

লিবনিজের ক্যালকুলাসের সাহায্যে এ dy ও dx নিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করা যেত। অন্য সাধারণ সংখ্যার মতোই। এ কারণেই আধুনিক গণিত ও পদার্থবিদরা নিউটনের চিহ্নের বদলে লিবনিজের প্রতীক ব্যবহার করেন। লিবনিজের ক্যালকুলাসের ক্ষমতাও নিউটনের ক্যালকুলাসের মতো। তবে প্রতীকের সুবিধার কারণে বলা চলে, একটুখানি বেশি। এত কিছুর পরেও, গণিতের অভ্যন্তরে সমস্যা থেকেই গেল। লিবনিজের অন্তরকেও ০/০ দিয়ে ভাগের মতো নিষিদ্ধ কাজ আছে। যে নিউটনের ফ্লুক্সোনকে বিতর্কিত করেছিল। এ সমস্যা না কাটা পর্যন্ত ক্যালকুলাস যুক্তির ভিত্তির বদলে দাঁড়িয়ে থাকবে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর। (আসলে বাইনারি বা দ্বিমিক সংখ্যা আবিষ্কারের সময়ও লিবনিজের মনে বিশ্বাস দৃঢ়ই ছিল। যেকোনো সংখ্যাকে এক গুচ্ছ ০ ও ১ দিয়ে লেখা যায়। তাঁর কাছে এটাই ছিল বা creation ex nihilo (ক্রিয়েশিও এক্স নিহিলো) বা শূন্য থেকে সৃষ্টি। তাঁর মতে মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে ১ (ঈশ্বর) ও ০ (ভয়েড বা শূন্যতা) থেকে। লিবনিজ এমনকি চেষ্টা করেছিলেন জেসুইটরা যেন এই বিদ্যা কাজে লাগিয়ে চীনাদের খৃষ্টান বানায়।)

ক্যালকুলাসকে এই মরমি ভিত্তি থেকে মুক্ত করতে গণিতবিদদের বহু বছর লেগে যায়। কারণ তারা ব্যস্ত ছিলেন ক্যালকুলাসের আবিষ্কার নিয়ে বিতর্কে।

ভাবনাটা যে নিউটনের মাথায়ই প্রথম এসেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেটা ১৬৬০-এর দশকের কথা। তবে তিনি সে কাজ প্রকাশ করেননি ২০ বছর পর্যন্ত। নিউটন ছিলেন জাদুকর, ধর্মতাত্ত্বিক, আলকেমিস্ট ও বিজ্ঞানী (বাইবেলের লেখা থেকে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঈসার (আ) দ্বিতীয় আগমন হবে ১৯৪৮ সালে)। তবে তাঁর অনেক কথাই ছিল প্রচলিত ধর্মবিরোধী। এ কারণে তিনি নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। অনিচ্ছুক ছিলেন গবেষণা প্রকাশের ব্যাপারে। ওদিকে নিউটনের চুপচাপ বসে থাকার মধ্যেই লিবনিজ নিজের মতো করে ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন। কদিন না যেতেই একে অপরের বিরুদ্ধে নকলের অভিযোগ আনলেন। ইংরেজ গণিত সম্প্রদায় নিউটনকে সমর্থন দিলেন। মুখ ফিরিয়ে নিলেন লিবনিজপন্থী মহাদেশের অন্য গণিতবিদদের থেকে। এর ফলে ইংরেজরা নিউটনের ফ্লুক্সোনে ডুবে রইলেন। গ্রহণ করলেন না লিবনিজের উন্নত প্রতীক। ফলে আবেগের বশে মহাদেশের অন্য গণিতবিদদের চেয়ে পিছিয়ে গেলেন ক্যালকুলাসের চর্চা ও অগ্রগতিতে।

ক্যালকুলাসকে আচ্ছন্ন করে রাখা শূন্য ও অসীমের সমস্যার মোকাবেলায় ইংরেজ কেউ এগিয়ে এলেন না। এলেন এক ফরাসী। প্রথম ক্যালকুলাস পড়তে গেলেই গণিতবিদরা লোপিটালের নাম জানতে পারেন। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, যে নামে লোপিটালের নাম জড়িয়ে আছে, তা কিন্তু তাঁর আবিষ্কার নয়।

হোপিটালের জন্ম ১৬৬১ সালে। পুরো নাম গিয়ম ফ্রাসোয়া আতোঁয়া ডে লোপিটাল। অভিজাত ঘরের সন্তান লোপিটাল ছিলেন খুব ধনী। জীবনের শুরতেই গণিতের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও কাটিয়েছেন। ছিলেন অশ্বদলের ক্যাপ্টেন। তবে শীঘ্রই ফিরে আসেন তাঁর মূল ভালবাসা গণিতের কাছে। টাকা দিয়ে সবচেয়ে ভাল যে শিক্ষক পাওয়া যায় তাই বেছে নিয়েছেন লোপিটাল। তিনি জোহান বার্নুলি। সুইশ গণিতবিদ ও লিবনিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্যালকুলাসের প্রাথমিক যুগের একজন বিশেষজ্ঞ। ১৬৯২ সালে বার্নুলি লোপিটালকে ক্যালকুলাস শেখান। নতুন এ গণিত লোপিটালকে মুগ্ধ করে। বার্নুলির নতুন গণিতের সব আবিষ্কার তাকে দেওয়ার ও ব্যবহার করার জন্য লোপিটাল বার্নুলিকে রাজি করান। বিনিময়ে দেন অর্থ। এর ফলাফল হিসেবে পাওয়া যায় একটি টেক্সট বই। ১৬৯৬ সালে লোপিটাল ক্যালকুলাস নিয়ে প্রথম টেক্সট বই লেখেন। নাম *Analyse des Infiniment Petits,* যার বাংলা অর্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের বিশ্লেষণ। এর মাধ্যমেই ইউরোপের বড় অংশ লিবনিজীয় ক্যালকুলাসের সাথে পরিচিত হয়। এ বইয়ে লোপিটাল ক্যালকুলাসের মৌলিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেই থেমে থাকেননি, উল্লেখ করেছেন নতুন দারুণ ফলাফলও। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটার নাম লোপিটালস রুল বা লোপিটালের নিয়ম।

এ নিয়ম প্রথমেই আঘাত করে ক্যালকুলাসের সর্বত্র উদয় হওয়া ঝামেলাময় রাশি ০/০-কে। একটি গাণিতিক ফাংশনের মান কোনো বিন্দুতে ০/০-এর দিকে যেতে থাকলে তার প্রকৃত মান বের করার একটি উপায় বলে দেয় নিয়মটি। নিয়মটি বলে, এরকম ভগ্নাংশের মান পেতে হলে লবের অন্তরককে হরের অন্তরক দিয়ে ভাগ দিতে হবে।৪যেমন ধরুন x/sinx রাশিটি। মান x = 0 হলে লব শূন্য। আবার হরও শূন্য (sin0 = 0)। ফলে রাশিটির মান হয় ০/০। তবে হোপিটালের নিয়ম থেকে এর মান পাওয়া যায় 1/cosx। কারণ x এর অন্তরক 1 এবং sinx এর অন্তরক cosx। x = 0 হলে cosx এর মান হয় 1। অতএব, রাশিটি হয় ১/১ = ১। একটু বুদ্ধি খাটালেই হোপিটালের নিয়ম অন্য অদ্ভুত রাশিগুলোর মানও দিয়ে দেয়। এই যেমন ∞/∞, 00, 0∞ এবং ∞0। এ সবগুলো রাশি থেকেই (বিশেষভাবে ০/০) আপনার ইচ্ছামতো মান পেতে পারবেন। এটা নির্ভর করবে লব ও হরের ফাংশনের ওপর। এ কারণেই ০/০কে অনির্ণেয়। এটা আর পুরোপুরি রহস্যের চাদরে ঢাকা থাকল না। খুব সাবধানে ০/০-এর দিকে এগোলে গণিতবিদরা এর কিছু তথ্য জানতে সক্ষম হচ্ছেন। শূন্য আর এমন কোনো শত্রু নয়, যাকে এড়িয়ে চলতে হবে। এটা চর্চা করার মতো একটা ধাঁধাঁ।

১৭০৪ হোপিটাল মারা যান। বার্নুলি এবার বলতে শুরু করলেন, হোপিটাল তাঁর কাজ চুরি করেছেন। সে সময় গণিত সমাজ এ দাবি উড়িয়ে দেন। হোপিটাল নিজেকে সক্ষম গণিতবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ওদিকে বার্নুলির আবার তক্ষণ ভাবমূর্তি খুব খারাপ। এর আগে তিনি আরেক গণিতবিদের প্রমাণ নিজের বলে দাবি করেছিলেন (অন্য গণিতবিদ আর কেউ নন, ছিলেন তাঁরই ভাই জ্যাকব বার্নুলি।) তবে এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর দাবির সত্যতা মেলে। হোপিটালের সাথে তাঁর যোগাযোগের ধরন থেকে তাঁর বক্তব্য প্রমাণিত হয়। তবে দূর্ভাগ্য তাঁর। ততদিনে হোপিটালের নাম নিয়মটার সাথে জড়িয়ে গেছে।

০/০ বিষয়ক বেশ কিছু সমস্যার সমাধানে হোপিটালের নিয়ম দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে মূল সমস্যা থেকে গেল। নিউটন ও লিবনিজের ক্যালকুলাস শূন্য দিয়ে ভাগের ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল এমং সংখ্যারও ওপর, যাদেরকে বর্গ করলে উধাও হয়ে যায়। লোপিটালের নিয়ম ০/০ -এর ///সমস্যা নিয়ে কাজ করে এমন হাতিয়ার দিয়ে যা নিজেই ০/০ কে ঘিরেই তৈরি।///// এটা একটি বৃত্তাকার যুক্তি। একদিকে পুরো পৃথিবীর গণিত ও পদার্থবিদরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে ক্যালকুলাসের ব্যবহার শুরু করেছেন। অপরদিকে প্রতিবাদের ধ্বনি ধেয়ে আসল গির্জা থেকে।

১৭৩৪ সাল। নিউটনের মৃত্যুর বহু বছর পরের কথা। আইরিশ বিশপ জর্জ বার্কলি *দ্য অ্যানালিস্ট* নামে একটি বই লেখেন। বইটির অপর নাম *অ্যা ডিসকোর্স অ্যাড্রেসড টু অ্যান ইনফিডেল ম্যাথেম্যাটিশিয়ান*। (ইনফিডেল বা অবিশ্বাসী বলতে খুব সম্ভব এডমন্ড হ্যালিকে বোঝানো হয়েছিল, যিনি সবসময় ছিলেন নিউটনপন্থী।) *দ্য অ্যানালিস্ট* বইয়ে তিনি নিউটনের (ও লিবনিজের) শূন্য নিয়ে কুটকৌশলের তীব্র সমালোচনা করেন।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকে তিনি আখ্যা দেন 'মৃত রাশির ভূত'। এছাড়া দেখান, এ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাশিগুলোকে এত সহজে মুক্তি দিলে অসঙ্গতি তৈরি হয়। এরপর কথার ইতি টানেন এভাবে, "আমি মনে করি, যে বা যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফ্লুক্সোন বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবধান মেনে নিতে পারে, তার ঈশ্বরের ব্যাপারে কখনও সন্দেহ করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।"

তথ্যনির্দেশ

১। স্ববিরোধী বক্তব্য বা দেখতে এক আসলে আরেক এমন জিনিসকে প্যারাডক্স বলে। যেমন, কেউ বলল, "আমি মিথ্যাবাদী।" তাহলে কি লোকটি আসলে মিথ্যাবাদী নাকি সত্যবাদী? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়ুন লেখকের বই *অসীম সমীকরণ*।

২। নিউটনের বয়স তিন বছর হলে তার মা আবার বিয়ে করে আলাদা হয়ে যান। এরপরে তাদের সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি। না না, হয়েছে। যেদিন নিউটন তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে ভেতরে রেখেই পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়ে আসেন।

৩। দুটি সংখ্যার গুণফল শূন্য হলে তাদের একটি বা দুটিই শূন্য হবে। গাণিতিক ভাষায় বললে, ab = 0 হলে হয় a = 0 বা b = 0 হবে। এর মানে হলো a2 = 0 হলে a = 0 হবে।

৪। এ নিয়মের উদাহরণ দেখুন নিচের উদাহরণে।

এমনিতে এ লিমিটের মান ০/০ আসে, যা অনির্ণেয় ও অর্থহীন। হোপিটালের নিয়ম থেকে এর মান পাওয়া যায়। লিমিটের অর্থ হলো ফাংশনের মান আসলে কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝা। এ ফাংশনে x-এর মান (-২) এর দিকে যেতে থাকে ফাংশনটা যেতে থাকবে (-১) এর দিকে। হোপিটালের নিয়ম মান পাওয়া সহজ করে দিল।

চিত্র ২৮.১